Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 346 – 350
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

সাঁওতাল আদিবাসী সমাজে নাম ও নামকরণ সংস্কৃতি : অতীত থেকে বর্তমান

মকর মুর্ম্মূ
বাংলা বিভাগ, সহকারী অধ্যাপক
কান্দি রাজ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেইল : makarmurmu@rediffmail.com

Keyword
আদিবাসী, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সাঁওতাল, নামকরণ, জানাম ছীটিয়ীর, চাচো ছীটিয়ীর।

Abstract
'আদিবাসী' শব্দটির মধ্যেই একটা আদি আদি ভাব আছে। ভারতের আদি বসবাসকারী মানুষই আদিবাসী। আদিম বা প্রাচীন মানব। একথা এশিয়া তথা অবিভক্ত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড রকমের সত্য। যদিও অতিসাম্প্রতিক কালে কেও কেও মনে করেন আদিবাসীদের আগেও এখানে মানব সমাজ বসবাস করত। যাই হোক সে এক অন্য বিতর্ক। আমরা আদিবাসী সম্পর্কে দু-চার কথা বলে মূল আলোচনা প্রবেশ করব।

Discussion
'আদিবাসী' শব্দটির মধ্যেই একটা আদি আদি ভাব আছে। ভারতের আদি বসবাসকারী মানুষই আদিবাসী। আদিম বা প্রাচীন মানব। একথা এশিয়া তথা অবিভক্ত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড রকমের সত্য। যদিও অতিসাম্প্রতিক কালে কেও কেও মনে করেন আদিবাসীদের আগেও এখানে মানব সমাজ বসবাস করত। যাই হোক সে এক অন্য বিতর্ক। আমরা আদিবাসী সম্পর্কে দু-চার কথা বলে মূল আলোচনা প্রবেশ করব।

ভারতবর্ষের প্রায় মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ আদিবাসীর বসবাস। পূর্ব ভারতের বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড –এই তিন রাজ্য বাদে, পশ্চিমবঙ্গে মোট ৩৮টি আদিবাসী গোষ্ঠীর বসবাস। [১৯৭৬ সালের 'দি সিডিউল্ড কাস্টস এ্যাণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইব অর্ডার (এ্যামেণ্ডমেণ্ট) এ্যাক্ট]। 'সাঁওতাল' তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রসঙ্গত 'আদিবাসী' ও 'সাঁওতাল' শব্দদুটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, সব 'সাঁওতাল' 'আদিবাসী' হলেও সব 'আদিবাসী' 'সাঁওতাল' নয়। যদিও 'আদিবাসী' শব্দটির জন্ম খুব প্রাচীন নয়। সমালোচক গবেষকের মতে,-

> "আদিবাসী শব্দটির জন্ম সম্ভবত বিশ শতকের চারের দশকে। ১৯৩২ সালে ঝাড়খণ্ডের দাবি যখন সবে উঠতে শুরু করেছে সেই সময় 'আদিবাসী' নামে একটি পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। এই প্রথম

স্বতন্ত্রভাবে আদিবাসী শব্দের ব্যবহার। এই আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব জয়পাল সিং Scheduled Tribe- বদলে Adibasi শব্দটি চেয়েছিলেন।"[১]

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতির কৃষ্টি-সংস্কৃতি সেই জাতির মজ্জাগত। এবং বৈচিত্র্যতায় ভরপুর। সাঁওতালরাও এর ব্যতিক্রম নয়। বলা যায় বেশ সমৃদ্ধও বটে। সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা ও সমৃদ্ধতা যেমন একদিনে গড়ে ওঠে নি, তেমনি যুগ যুগ ধরে অন্তহীন ভাবে বিশুদ্ধতা বজায় থাকবে এমনটাও নয়। সমাজ-সংস্কৃতি সদাই বহমান। সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিবর্তনের পথেই তার বহমানতা। বর্তমান সময়ের যেকোন জাতির দিকে মনোনিবেশ করলেই বেশ বোঝা যায়।

মানুষের নামকরণ বিষয়ে সঠিকভাবে জানা যায় না। অনুমান করা যায় মাত্র।যদিও প্রাচীনযুগে মানব সমাজ মানুষের নামকরণ বিষয়ে সচেতন ছিল বলে মনে হয় না। সে যুগে প্রত্যেক জাতি, গোষ্ঠী, দল তাদের নিজস্ব টোটেম, ট্যাবু বা দলের সর্দারের মাধ্যমে গোষ্ঠি সমাজ গঠিত হত। যাতে খুব সহজেই আপন আপন দলের মানুষকে চিহ্নিত করা যায়। সেখানে ব্যক্তি মানুষের কোন মূল্য থাকত না। আবার বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বিশেষ কোন চিহ্নের ব্যবহারের কথাও জানা যায়।

নাম সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই প্রথমেই দুই প্রথিত যশা সাহিত্যিকের কথা স্মরণ করা যায়। একজন শেক্সপীয়ার। যিনি মোটেও নামকে গুরুত্ব দিতে চান নি। অন্য জন রবীন্দ্রনাথ। যিনি মনে করেন নামের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে। প্রাচীন গ্রীকেও নামকরণের প্রথা প্রচলিত ছিল। সেখানে 'Identity' ও 'Origin' এই দুটি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানা যায়।

'নাম' শব্দের অভিধানগত অর্থ হল –

> "নাম (মন) বি.১ যে শব্দের দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয় জানা যায়, আখ্যা বা সংজ্ঞা (নাম রাখা, নাম দেওয়া, লোকের নাম, জিনিসের নাম)।"[২]

'নাম' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে,

> "ইংরেজি name (নেইম) শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক শব্দ nama (নামা) থেকে, এটির কাছাকাছি প্রাচীন জার্মান শব্দ namo (নামো) থেকে, ল্যাটিন nomen (নোমেন), এবং পরবর্তীতে গ্রিক শব্দ (ওনোমো) থেকে।"[৩]

আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে কৃষ্টি - সংস্কৃতির সমৃদ্ধতা সর্বজন বিদিত। সমাজের পরতে পরতে রয়েছে কৃষ্টি-সংস্কৃতির উৎসাহ ব্যঞ্জক রোমাঞ্চকর উপস্থাপনা। সামাজিক জীবনে আচার, সংস্কার, বিশ্বাস কৃষ্টি - সংস্কৃতিই আদিবাসীদের প্রাণ। এই বিশিষ্ট্যতা তাদের এক তারে বেঁধে রাখতে সহায়তাও করেছে। সাঁওতাল সংস্কৃতির সবটাই মৌখিক। পরম্পরাগত। লিখিত দলিল বলতে 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা' গ্রন্থ। সাহেব স্ক্রেফসরুড সাঁওতাল গুরু কলেয়ান 'হাড়াম' [বুড়ো] এর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে রোমান হরফে গ্রন্থটি ১৮৮৭ সালে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটিই একমাত্র প্রাচীন প্রামানিক নিদর্শন। সাম্প্রতিক ২০১০ সালে 'পশ্চিমবঙ্গ সান্তালি আকাদেমি' বাংলা হরফে সাঁওতালি ভাষায় পুনর্মুদ্রণ করে। গ্রন্থটিতে সাঁওতাল কৃষ্টি-সংস্কৃতির মূল্যবান বিষয় স্থান অধিকার করে।

প্রথমেই যে বিষয়টি স্থান পায় তা হল 'জানাম ছাটিয়ীর' [জন্ম নামকরণ]। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, সাঁওতাল সমাজের সন্তানের 'ছাটিয়ীর' বা 'নামকরণ' এর দুটো দিক আছে, যথা—

১. 'জানাম ছাটিয়ীর'
২. 'চাচো ছাটিয়ীর' [শৈশব নামকরণ]

দ্বিতীয়, শুভ কর্মের কোন ধরাবাঁধা দিনক্ষণ নেই। কিন্তু সন্তানের বিবাহের পূর্বে অবশ্যই এটি সম্পন্ন করতে হবে। অর্থাৎ এই নামকরণ না হলে কোন মতেই সন্তানের বিবাহ দেওয়া যায় না। প্রথমটিই আমাদের আলোচ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই সাঁওতাল সংস্কৃতিতে নামকরণ সংস্কারটি তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়।

প্রাচীন যুগে তো বটেই সাম্প্রতিক সময়েও সাঁওতাল সমাজে সন্তানের জন্ম থেকে নামকরণ ও শুদ্ধিকরণে ধাই মা এর গুরুত্ব অপরিসীম। অন্তত প্রাচীন কালে সন্তানের জন্ম সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে এই দ্বিতীয় মা'ই এক ও অদ্বিতীয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৌলতে ধাই মা'র স্থান সংকুচিত হলেও। তাকে লাগেই। পুত্র সন্তান হলে নামকরণের গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদিত হয় ৫ দিনে আর কন্যা সন্তান হলে ৩ দিনে। জন্মলগ্ন থেকেই নারী পুরুষের বিভেদের কারণ সঠিকভাবে জানা যায় না। কেননা পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ হলেও নারীরাও যথেষ্ট মর্যাদার অধিকারী। যাই হোক সন্তান জন্মানোর পর নির্দিষ্ট দিনে গ্রামের 'নায়কে' [পূজারী], 'কুডাম নায়কে' [সহকারী পূজারী], 'মাঝি' [গ্রাম প্রধান], 'পারানিক' [সহ প্রধান], 'জগ মাঝি' [সাংস্কৃতিক প্রধান], 'জগ পারানিক' [সহ সাংস্কৃতিক প্রধান], 'গোডেত' [গ্রাম প্রধানের বার্তাবাহক] সহ গ্রামের পাঁচজন সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হয় সন্তানের বাড়িতে। শুদ্ধিকরণের সব কর্ম সম্পন্ন হলে আসে নামকরণের পালা। এবং নামাচার সম্পন্ন হলে সেই নাম ধাই মা প্রণাম করতে করতে সকলকে জানায়। বা অবগত করায়। এও অনুরোধ করে যে আজ থেকে পুত্র হলে শিকার যাত্রায় আর কন্যা হলে জল আনতে যেন এই নামেই ডাকা হয়। আর অন্তিমে সামান্য কিছু আচার আচরণ পালনের মাধ্যমে এই পর্বের সমাপ্তি ঘটে।[৪]

কিন্তু আমাদের মূল আলোচনার বিষয় নাম ও নামকরণের রীতি-পদ্ধতি নিয়ে। নামকরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সহ নামকরণের কয়েকটি আনুষঙ্গিক বিষয় ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা যেতে পারে—

প্রথমত নামকরণের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার অনুস্মরণ বা রীতি পদ্ধতির কথা–

ক. কোন পরিবারে প্রথম পুত্র সন্তান জন্মালে নামকরণের ভাগীদার হবে ঠাকুর বাবা। অর্থাৎ সন্তানের বাবার পিতার নামে নামকরণ। আর প্রথম কন্যা সন্তান হলে ভাগীদার হবে ঠাকুর মা। অর্থাৎ সন্তানের বাবার মাতার নামে নামকরণ। সামগ্রিক ভাবে বলা যায় প্রথম পুত্র বা কন্যা সন্তানের নামকরণ সন্তানের বাবার তরফে।

খ. দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হলে সন্তানের মায়ের বাবার নামে নামকরণ হয়। আর কন্যা সন্তান হলে কন্যার মায়ের মা'র নামে নামকরণ হয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় পুত্র বা কন্যা সন্তানের নামকরণ সন্তানের মা'য়ের তরফে।

গ. তৃতীয় পুত্রের জন্ম হলে জেঠা বা কাকার নামে নামকরণ আর কন্যা সন্তান জন্ম হলে জেঠিমা'র বা কাকি মা'র নামে নামকরণের রীতি প্রচলিত।

ঘ. চতুর্থ পুত্র মামা দাদুর ভায়ের নামে নামকরণ, আর কন্যা হলে তার স্ত্রীর নামে নামকরণ।[৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যমজপুত্র বা যমজকন্যা বা একই সাথে তার বেশি সন্তানের নামকরণ ঐ একই রীতি অনুস্মরণ করা হয়। অর্থাৎ প্রথম বাবা'র তরফ , পরে মা'য়ের তরফ, তার পর কাকার তরফ– এই ক্রম অনুসৃত হয়। পরবর্তী সন্তানদের নামকরণে আপন পূর্বসূরিদের অনুপস্থিতিতে নামকরণের সুযোগ নিকট আত্মীয়রা পেয়ে থাকে। এই সমস্ত নামকরণ অধিকারী পূর্বসূরিদের কাছে বেশ গর্বের। কারণ ঐ সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্যও পালনে সর্বদা যত্নশীল থাকে। ফলে ঐ সন্তানের যে কোন শুভকর্মে তার মতামতের গুরুত্ব অনেক বেশি।

অনুমান নামকরণের এই রীতিতে আত্মীয়তার বন্ধনও বেশ সুদৃঢ় হয়। আসলে নামকরণের এই বিশেষ রীতির পিছনে পূর্বসুরিদের উত্তরসূরিদের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার বিশেষ প্রবণতাও লক্ষণীয়।

দ্বিতীয়ত নাম নির্বাচন। অর্থাৎ সন্তানের নাম কি হবে? সাধারণত আদিবাসী সাঁওতাল সমাজ সন্তান সন্ততিদের নামকরণে কোন উচ্চাকাঙ্খা পোষণ করে না। বিশেষ কয়েকটি দিক বিবেচনা করে নাম নির্বাচন করা হয়। যথা-

ক. সন্তান যে দিন বা বারে জন্মগ্রহণ করছে সেই মতো নাম। যেমন- রবিবার হলে 'রবিলাল', সোম বার হলে 'সোম্বারি' বা 'সোমনাথ, 'বুধবারে হলে 'বুধি' 'বৃহস্পতি' বারে হলে 'লক্ষী', 'শুক্রবার' 'শুকুমনি' বা 'শুকলাল' 'শনিবার' এ 'শুনিরাম' ইত্যাদি।

খ. কোন পুণ্য তিথিতে হলে সেই মতো নাম। যেমন- ষষ্ঠিতে হলে 'ষষ্ঠিপদ', 'বিজয়ায়' হলে 'বিজয়', 'পার্বণ' এ হলে 'পার্বতী', আর 'মকর' সংক্রান্তিতে হলে 'মকর' ইত্যাদি।

গ. নামকরণের এই প্রবণতার ব্যতিক্রমও রয়েছে।

তৃতীয়ত নামের সৌখিনতা বা সৌন্দর্য্য। ভালো বা মন্দ নাম। পূর্বে উল্লেখিত প্রথম দুই ধাপ হল নামকরণের একদিক, আর অন্যটি এই যে ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে সাধারণত সাঁওতালদের নামকরণে সৌন্দর্য্যের তেমন খেয়াল রাখা হয় না। বাবা মা বা পরিজনের কারও মাথা ব্যাথা থাকে না। অর্থাৎ নামের সুন্দরতা বিষয়টি উপেক্ষিত। কোন কিছু একটা নাম থাকলেই হল। আসলে নাম তো নামই তাতে কি 'আসে যায়'র মতো। নামের অদ্ভূতত্ত্বের বিষয়টি যে শুধু অনাদিবাসীর কাছেই তেমনটা নয় আদিবাসীদের কাছেও সমান সত্য।

চতুর্থত একাধিক নাম। সাঁওতালদের একাধিক নাম থাকে। বাবা মা'র বা পরিবারের প্রদত্ত নাম ছাড়াও। একাধিক নাম প্রদানের বিষয়টি পরিবারের কোন হাত থাকে না। এক্ষেত্রে সমাজই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সমাজ স্বতফূর্তভাবে এগিয়ে এসে সন্তানের কপালে নামের রেখা এঁকে যায়। নামকরণের এই ধারা শৈশব থেকে কৈশোর-যৌবন পর্যন্ত চলতে থাকে। এমনকি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত চলতে পারে[সাধরণত এই নামগুলি উক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতেই উচ্চারিত]। কে, কখন ঐ নাম দিয়েছিল তার কোন তত্ত্ব তলাস করা হয় না। কোন এক বিশেষ নামের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করলে। সেই নামই প্রচলিত হয়। তার কোন হেরফের হয় না। হোক না সে যতই ভালো বা খারপ। সমাজের দিকে তাকালেই এ ধরণের প্রচুর নামের সন্ধান পাওয়া যায়। অনুসন্ধান করে জানা যায় বিশেষ কোন সময়ে সন্তানের বিশেষ কোন রূপ, গুণ, কর্ম বা ইচ্ছা বা প্রিয় বিষয়ের প্রতি আগ্রহকে কেন্দ্র করে নাম দিয়ে দেওয়া হয়। যেমন—

ক. পরিবারের বড়ো বা ছোট ছেলের নাম 'বড়ো' বা 'ছোট' বা 'গ্যাড়া'।

খ. দেখতে কাল হলে নাম 'কাল'।

গ. বুদ্ধি কম হলে 'হাঁদু'।

ঘ. কোন একজন শাক খেতে ভালোবাসত বলে নাম 'শাগ'। 'জব্বর', 'লুলু', 'পচাই', 'কচে', 'লোণ্ডো' প্রভৃতি আরও অনেক নামের সন্ধান পাওয়া যায়।

সব মিলিয়ে স্মরণাতীত সময় থেকে নামকরণের এই ধারাই চলে আসছিল। তবে আধুনিক সময়ে নাম নির্বাচনে কিছুটা পরিবর্তন চোখে পড়ে। পূর্বোক্ত নাম ছাড়াও আর একটা নাম থাকত যা সরকারী নানান দলিল দস্তাবেজে ব্যবহার হত। কিন্তু এও জানা যায় যে আধুনিক সময়ে উপরি উক্ত নামগুলোর কোন নাম যে সরকারী বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। সেটা সঠিক ভাবে সে জানে না। ফলে নামকরণে অত্যাধিক্য বা উদাসীনতার কারণে সরকারী ক্ষেত্রে একাধিক নাম নিয়ে নানান সমস্যা দেখা দিত।

পঞ্চমত নামের সাপ্রদায়িকতা। অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ বা জৈন্য প্রভৃতি জাতির জাতিগত নামকরণের এক প্রবণতা থাকে। এক এক জাতি গোষ্ঠি এক এক ধরণের নাম ব্যবহার করে। ফলে খুব সহজেই তাদের অন্যান্য জাতি থেকে পৃথক করা যায়। কারণ নামের মধ্যে কখনও কখনও জাতি বা গোষ্ঠীর সংস্কারে আলো বিচ্ছুরিত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু সাঁওতাল সমাজের মধ্যে 'সাঁওতালি' [বীর, বুরু, ঝারণা, রিমিল] নাম রাখার ব্যাপক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যদিও ব্যতিক্রম আছে।

সব মিলিয়ে এই গেল নামকরণ বা নামাচারের প্রাচীন ঐতিহ্য। এবং আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে নামাচারের ঐতিহ্য সম্মানের সাথে পালন করে চলেছে। বিশ্বায়ন বিশ্বের সমস্ত জাতিকে প্রভাবিত করেছে। আদিবাসীরাও এর বাইরে নয়। অর্থাৎ যুগের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে আদিবাসীদের জীবনে আসে নানা পরিবর্তন। সংযোজন, বিয়োজন, বিবর্তন ও অভিযোজনের মধ্য দিয়েই ঐতিহ্যকে সম্মান আর বর্তমানকে সাথে নিয়ে আগামীর পথে চলতে, জানতে চায়।

বর্তমান সময়ে সাঁওতালদের নামকরণে ঐতিহ্যকে নাম মাত্র অনুস্মরণ করা হয় নাম মাত্র। গুরুত্ব অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। তুলনায় সন্তানের নামকরণে বাবা মা'য়ের গুরুত্বই সর্বাধিক। নামের ভালো-মন্দ বা সৌখিনতার প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। এমনকি একাধিক নাম থাকলেও সৌখিন বা সৌন্দয্যের দিকটি উপেক্ষিত নয়। আবার নামকরণে সামাজিকতা বা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার চেয়ে বাবা মা'র গ্রহণযোগ্যতাই শেষ কথা। সমাজের কেও কোন

নাম প্রদান করলে সেই নামকে বিশেষ পাত্তা দেওয়া হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে বাবা-মা আপত্তিও করে থাকে। সে কারণে নামকরণের উদাসীনতাকে ত্যাগ করে নির্দিষ্ট এক নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। যেন কোন ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি না হয়।

বিবর্তনের ধারায় সাঁওতালাও গোষ্ঠী থেকে ধীরে ধীরে একটি জাতি হয়ে উঠছে। কারণ সমাজ এখন এক ধরণের মিশ্র সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে চলেছে। এর মূলে রয়েছে আধুনিকতা অথা বিশ্বায়ণ। প্রভাব পড়েছে নামকরণেও। ফলে নামেও প্রবেশ করেছে মিশ্র সংস্কৃতি। উপরিউল্লিখিত ব্যতিক্রমি সাঁওতালদের সেই সব নামের মধ্যেই নেই কোন জাতি বা গোষ্ঠির ছোঁয়া। তাই মনে করা হয় অস্তিত্ব সংকটের নানান কারণে নামকরণও যোগ রয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান, 'প্রসঙ্গ আদিবাসী', অববিট পাবলিশিং, আগষ্ট ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ২০
২. ভট্টাচার্য, সুভাষ, (সম্পা.), 'সংসদ বাংলা অভিধান', সাহিত্য সংসদ, ডিসেম্বর ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৪৫৫
৩. w https://bn.m.wikipedia.org>wiki সংগ্রহ তারিখ- ২১/১২/২০২২
৪. এল ও স্ক্রেফসরুড, রেভারেনড, 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা', পশ্চিম বঙ্গ সান্তালি আকাদেমি, জানুয়ারি ২০১০, কলকাতা, পৃ. ১৯-২০
৫. ঐ, পৃ. ২০

গ্রন্থপঞ্জী :

১. বন্দ্যোপাধ্যায় সুমহান, 'প্রসঙ্গ আদিবাসী', অফবিট পাবলিশিং, আগষ্ট ২০১৪, কলকাতা
২. ভট্টাচার্য সুভাষ (সম্পা), 'সংসদ বাংলা অভিধান', সাহিত্য সংসদ। ডিসেম্বর ২০০৮, কলকাতা
৩. স্ক্রেফসরুড এল ও, 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা', পশ্চিম বঙ্গ সান্তালি আকাদেমি, জানুয়ারি ২০১০ কলকাতা